আলোচনাপত্র | Occasional Paper

সামষ্টিক অর্থনীতি, বাজেট প্রস্তাবনা ও সর্বজন

রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর

Centre for Governance Studies

সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) শাসনব্যবস্থা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং গণতন্ত্রায়ন বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন করে এবং এই সব বিষয়ে একাডেমিক পরিসর, সরকার, ব্যক্তিখাত, সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে। বিস্তারিতের জন্যে দেখুন- http://cgs-bd.com/

সিজিএস আলোচনাপত্র-এ সমকালীন নীতি-নির্ধারনী বিষয়ে আলোচনা, গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল, নিবন্ধ, সেমিনার ও সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং চলমান গবেষণার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করা। আলোচনাপত্রে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট গবেষকের।

cgs **সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ**
৪৫/১ নিউ ইস্কাটন রোড, তৃতীয় তলা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

সিজিএস আলোচনাপত্র ৩: সামষ্টিক অর্থনীতি, বাজেট প্রস্তাবনা ও সর্বজন, রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, জুন ২০১৯

১.ভূমিকা

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার মধ্যেই দেশের ৪৮তম জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০ পেশ করা হয়েছে। সরকারি হিসেবে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি তড়তড় গতিতে এগোচ্ছে। অন্যদিকে জাতীয় আয় বা জিডিপির হিসেব, গুণগত মান এবং স্থিতিশীলতা নিয়ে ঢিমেতালে কথাবার্তা হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, বৈষম্য আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই ধারা কর্মসংস্থান তৈরী করতে পারছে না। অংশগ্রহণ বাড়লেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতের গুণগত মান প্রশ্নের সম্মুখীন।

বাজেটের পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া, খাতভিত্তিক বরাদ্দ ও সমস্যা নির্ধারণ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হচ্ছে। অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ অত্যধিক। প্রতি বছরই বাজেটে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ঘাটতি মেটাতে ঋণের পরিমাণও বাড়ছে। বাজেট বাস্তবায়নের হারেও দেখা যায় নিম্নমুখীতা।

সাধারণ জনগণ করের সিংহভাগ বহন করলেও প্রাপ্তি সামান্য। সরকার প্রবৃদ্ধি হারের উচ্চ গতি দাবি করলেও তা অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সূচকের পরিবর্তনের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একদিকে দারিদ্র্য কমার হার এবং প্রকৃত মজুরি যেমন হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে অসমতা এবং বেকারত্ব হু-হু করে বাড়ছে।

ব্যয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আয় বাড়ছে না । ফলে বাজেট ঘাটতি বেড়েই চলছে। সাধারণ ভোক্তা জনগণ কর দিয়েই যাচ্ছেন। তাঁদের উপর করের বোঝা বাড়ছে। কারণ আয়-নিরপেক্ষ মূল্য সংযোজন করই (মূসক) সরকারি ব্যয় নির্বাহের প্রধান উৎস। প্রতি বছরই মূসকের আওতা বাড়ানো হচ্ছে। জাতীয় আয়ের এত বড় আকার বাড়লে আয়কর অনেক বাড়ার কথা, কিন্তু আয়করের পরিমাণে তেমন পরিবর্তন নেই বললেই চলে। অর্থাৎ কর কাঠামো ব্যাপকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল রয়ে যাচ্ছে। ফলে কর-জিডিপি অনুপাতেও বাংলাদেশের অবস্থান অনেক উন্নয়নশীল দেশের থেকে নিচে।

রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা এবং আদায়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। ক্রমাগত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতি মারাত্মক ঋণ-সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে যেমন ঋণ বাড়ছে অন্যদিকে নিম্নের আয়ের সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা বাড়ছে।

আমদানি ব্যয় বাড়লেও সে অনুপাতে রপ্তানি আয় বাড়ছে না। ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতি লক্ষণীয়। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও এখনই তার সুদাসল পরিশোধ করতে হচ্ছে না। পরিশোধ করা শুরু হলেই সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

জাতীয় আয়ের হিসাব, গুণগত মান এবং স্থিতিশীলতা নিয়ে ঢিমেতালে কথাবার্তা হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, বৈষম্য আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই ধারা কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে না। অংশগ্রহণ বাড়লেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতের গুণগত মান প্রশ্নের সম্মুখীন।

প্রবৃদ্ধির হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য কমার হারও বাড়ার কথা। অথচ সরকারি হিসেব মতে, দারিদ্র্য কমার হার কমেছে। বেকারত্বের হারও বাড়ছে। চাহিদার তুলনায় নতুন কর্মসংস্থান তৈরী হচ্ছে না। ২০১০-২০১৬ সময়কালে পুষ্টি গ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান সন্তোষজনক না হওয়ায়, দক্ষ শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে বিদেশ থেকে দক্ষ শ্রম আমদানি করতে হচ্ছে। এভাবে বিদেশীদের পেছনে ব্যয়ের কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে। অধিকন্তু, ফি-বছর স্বাস্থ্য খাতে ব্যক্তিপ্রতি খরচ বেড়েই চলেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতাধীন জনগোষ্ঠীর শতকরা হার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, সুপেয় পানির মতো অন্যান্য নাগরিক সেবাও দুরবস্থার মধ্যে চলছে। সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক চিত্র উচ্চ প্রবৃদ্ধির দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

জনগণের করের টাকায় ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং সরকারি কর্মচারীদের ভরপোষণ যোগান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ জনগণ পর্যাপ্ত নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ জনগণের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে গোষ্ঠীতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে। এই গোষ্ঠীতন্ত্রের একদিক ঋণ-খেলাপিদের মতো বিভিন্ন সুবিধাভোগীরা অন্যদিকে আমলাতন্ত্র। পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে সম্পদ গোষ্ঠীতন্ত্রের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে।

গত দশ বছরে খেলাপি ঋণ সর্বোচ্চ। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বদলে তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে। ফলে ভালো ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধে আগ্রহ হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

একইভাবে প্রকৃত খাতের অবস্থাও নাজুক। গত ছয় বছরে বড় ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অর্থনীতি একটিমাত্র খাতের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। তৈরী পোশাক শিল্পের বাইরে অন্য কোন খাতের বিকাশ দেখা যাচ্ছে না। ফলে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরী বাধার সম্মুখীন। শিল্পের বহুমুখীকরণ না হওয়া এবং রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য না থাকায় অর্থনীতি ক্রমশ ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে।

এই প্রেক্ষাপটে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেট সরকারের রাজস্ব নীতির অন্যতম অস্ত্র হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারত্ব, দারিদ্রের মতো জনগণের অন্যান্য মৌলিক সমস্যা মোকাবিলা করতে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখবে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে গুণগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ ও দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরীতে বাজেটের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনা করা হয়েছে, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগে উৎসাহ দানে ব্যবসায়িক আস্থা ফিরিয়ে আনতে বাজেটে কী কী নীতি এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারের রাজস্বনীতির সাথে মুদ্রানীতির ভারসাম্য আনায়নের মাধ্যমে ভঙ্গুর আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বাজেটে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আশু ঋণ চক্রজাল থেকে অর্থনীতিকে উদ্ধারের জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। সবশেষে, টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রকৃত খাতকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করতে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২.১: জাতীয় আয়-প্রবৃদ্ধি হিসাবের গরমিল দূর হবে কবে?

সরকারি হিসেবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি তড়তড় গতিতে এগোচ্ছে। জাতীয় আয় বা জিডিপি হচ্ছে বিনিয়োগ, ভোগ, সরকারি ব্যয় এবং আমদানি- রপ্তানির সমষ্টি। এই চলকগুলোয় পরিবর্তন আসলে জিডিপি কমে বা বাড়ে।

বিনিয়োগ সঞ্চয় থেকে আসে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় এবং জাতীয় সঞ্চয় উভয় অনুপাতই কমেছে। দেশজ সঞ্চয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপির ২৫.৩৩ শতাংশ থেকে কমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২.৮৩ শতাংশ হয়েছে (সারণী ১) । অন্যদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক প্রাক্কলনে দেশজ এবং জাতীয় উভয় ধরণের সঞ্চয় সামান্য বৃদ্ধি পেলেও তা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় যৎসামান্য। সঞ্চয় তেমন বাড়ছে না। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের আয় কমেছে অথবা ভোগ ব্যয় এত বেড়েছে যে তারা সঞ্চয় করতে পারছেন না বিধায় বিনিয়োগও বাড়ছে না।

সারণী ১: সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ভোগ (জিডিপি'র শতকরা)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
দেশজ সঞ্চয়	২২.০৪	২২.০৯	২২.১৬	২৪.৯৮	২৫.৩৩	২২.৮৩	২৩.৯৩
জাতীয় সঞ্চয়	৩০.৫৩	২৯.২৩	২৯.০২	৩০.৭৭	২৯.৬৪	২৭.৪২	২৮.৪১
বেসরকারি বিনিয়োগ	২১.৭৫	২২.০৩	২২.০৭	২২.৯৯	২৩.১০	২৩.২৬	২৩.৪০
সরকারি বিনিয়োগ	৬.৬৪	৬.৫৫	৬.৮২	৬.৬৬	৭.৪১	৭.৯৭	৮.১৭
বেসরকারি ভোগ	৭২.৮৫	৭২.৫৭	৭২.৪৪	৬৯.১৩	৬৮.৬৭	৭০.৮১	৬৯.৭৭
সরকারি ভোগ	৫.১২	৫.৩৪	৫.৪০	৫.৮৯	৬	৬.৩৬	৬.৩০

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৯

উপরন্তু, গত কয়েক বছর ধরেই ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ স্থবিরতার খাদে খাবি খাচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২২ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসে ২৩ দশমিক ২৬ শতাংশে স্থবির হয়ে আছে। সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ শূন্য দশমিক ৫৬ শতাংশ বেড়েছে (সারণী ১)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেসরকারি এবং সরকারি বিনিয়োগ যথাক্রমে শূন্য দশমিক ১৪ ও শূন্য দশমিক দুই শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি মোটেও প্রবৃদ্ধির উল্লম্ফন ধারার কাছে তেমন কোন গতিরই না।

আবার পুরো সঞ্চয়ও বিনিয়োগে পরিণত হচ্ছে না। দিন দিন সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মধ্যে ফারাক বাড়ছে। পুঁজি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে বা পাচার হলে এই ফারাক বাড়ে। গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র হিসেবে ২০০৬-২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ থেকে ৫দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হয়ে গেছে।

জাতীয় আয় এই হারে বাড়তে হলে ভোগ বাবদ ব্যয় থেকেই উল্লম্ফন ঘটতে হবে। কিন্তু ভোগ বাড়ছে না। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই ভোগ বাড়লেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী তা বরং কমেছে (সারণী ১)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভোগ যথাক্রমে ৬ শতাংশ এবং ৬৮দশমিক৬৭ শতাংশ ছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬দশমিক৩৬ এবং ৭০দশমিক ৮১ শতাংশে বেড়ে দাঁড়িয়েছে । অন্যদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি ভোগ কমে যথাক্রমে ৬দশমিক ৩০ এবং ৬৯দশমিক ৭৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভোগ বাবদ ব্যয় বাড়লে মানুষের প্রকৃত আয় বা ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার কথা। পরিসংখ্যান ব্যুরোর জাতীয় আয় হিসাব অনুযায়ী, প্রকৃত জাতীয় আয় ২০০৯-১০ সময়কাল থেকে ২০১৫-১৬ সময়কালে ৪২ শতাংশ বেশি হয়েছে। এ সময়কালে প্রকৃত মাথাপিছু আয় ৩১ শতাংশ বেড়েছে । সমানতালে ভোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথা ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ভিন্ন কথা বলে। উক্ত জরিপের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১০ সালের তুলনায় ব্যক্তিপ্রতি প্রকৃত আয় ২ শতাংশ কমেছে এবং ভোগের জন্য প্রকৃত ব্যয় প্রায় ১ শতাংশ কমেছে । প্রকৃত আয়ের সঙ্গে পুষ্টি গ্রহণের হারও সম্পর্কিত। জরিপ মতে, ২০১০ সালের তুলনায় পুষ্টি গ্রহণের হার ৫ শতাংশ কমে ২ হাজার ৩১৮ কিলোক্যালরি থেকে ২ হাজার ২১০ কিলোক্যালরিতে পৌঁছেছে (খানা জরিপ, ২০১৬)।

জনগণের একটা বিরাট অংশ বেকার থাকায় ও বেকারত্ব বাড়ায় আয় করছে না। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএলও বলছে, ১৫-২৯ বছর বয়সী না অধ্যয়নরত, না কোন কর্মে ও না প্রশিক্ষণে নিয়োজিত যুবকের সংখ্যা ২০০৫ সালের শতকরা ৩১ ভাগ থেকে ১০ বছরে ১০ ভাগ বেড়েছে । দক্ষিণ এশিয়ায় বেকার যুবকের হারও বাংলাদেশে সবচে' বেশি, শতকরা ৯দশমিক ৪৫ ভাগ। ব্রিটিশ কাউন্সিল বলছে, শিক্ষিত যুবকদের শতকরা ৪৭ ভাগ বেকার। শিক্ষিত মানুষের দক্ষতা বেশি - এই অনুমিতিতে তাদের আয় ও সঞ্চয় বেশি হওয়ার কথা থাকায় তা' থেকেও দেশ বঞ্চিত হচ্ছে । উপরন্তু অধিকাংশ মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করায় মজুরি ও অধিকার দুইই কম।

আইএলও বলছে, প্রকৃত মজুরি কমেছে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ কমেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ২০০৮-১৭ সময়কালে বাংলাদেশের মানুষের গড় প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে কম (৩দশমিক ৪ শতাংশ)। গোটা দক্ষিণ এশিয়ার গড় হিসাব ৩দশমিক ৭ শতাংশ। এই সময়কালে ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকার গড় প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৫দশমিক ৫, ৪দশমিক ৭ এবং ৪ শতাংশ ছিল।

জাতীয় আয় বাড়লে দারিদ্র্য কমার হারও বাড়ার কথা। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর দারিদ্র্য কমার হার ছিল ১দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে এই হার ১ দশমিক ২ শতাংশে নেমেছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য কমার হার কমছে। তাহলে জিডিপি বৃদ্ধির ফলাফল কোথায় যাচ্ছে?

জাতীয় আয়ের হিসাবের তৃতীয় অংশটি আসে আমদানি ও রফতানির নিট আয় থেকে। আমদানি ব্যয় সবসময়ই বেশি থাকলেও ২০১১-১২ অর্থবছরের ১৮দশমিক২ শতাংশের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পণ্যদ্রব্যের রফতানি-জিডিপি অনুপাত কমে হয়েছে ১৩দশমিক ২ শতাংশ। বাণিজ্য ও চলতি লেনদেনে ঘাটতি বাড়ছে যা জিডিপিতে নেতিবাচক প্রভাব

ফেলার কথা। রফতানি খাতের বহুমুখীকরণ এবং বৈচিত্র্য নাই। রফতানিতে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হতে থাকা পোশাক খাতে রিটেনশনও খুব কম। ব্র্যান্ডগুলো নির্দিষ্ট কিছু রিটেইলার থেকে উপকরণ কিনতে বলে। মূল্য সংযোজন ২০ শতাংশের বেশি থাকে না। পোশাকখাতের অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি সামান্য বাড়লেও দক্ষদের প্রকৃত মজুরি কমেছে। ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষিতে না পেরে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বাধ্যবাধকতায় অটোমেশন হলে অদক্ষ শ্রমিক চাকরি হারাবে। আরেকটা বড় রকম কর্ম সংকোচনের সম্মুখীন হতে হবে।

সরকারি ব্যয় বাড়ছে প্রতিবছর। সিংহভাগই অনুৎপাদনশীল খাতে। অবকাঠামো ব্যয় সর্বাধিক। প্রকল্প ব্যয় বার বার বাড়ানো হয়। পদ্মা সেতু নির্মাণের খরচ বাড়তে বাড়তে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকাতে ঠেকেছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব বলছে, চার লেন সড়ক তৈরিতে ভারতে ১১ থেকে ১৩ লাখ ডলার ও চীনে ১৩ থেকে ১৬ লাখ ডলার খরচ হয়। বাংলাদেশে ৫০ লাখ থেকেও বেশি লাগছে।

রেলপথ নির্মাণ ব্যয়ও বাংলাদেশ সর্বোচ্চ। উন্নত দেশগুলোতে প্রতি কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয় গড়ে ৩১ কোটি টাকা। বাংলাদেশে সর্বশেষ ঢাকা-পায়রা বন্দর রেলপথ নির্মাণেই ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার রেলপথের প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় ধরা হয়েছে ২০৩ কোটি টাকা। অথচ ভারতে সিঙ্গেল লাইনের রেলপথ নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে গড়ে ব্যয় হয় ১২ কোটি টাকা। চীনে ট্রেন চলাচলের জন্য ২০০ কিলোমিটার গতিবেগের রেলপথ নির্মাণে কিলোমিটার প্রতি খরচ হয় ৭৫ কোটি টাকা। খরচের এই বিপুল পরিমাণ পার্থক্য নিয়ে বিরাজমান ধোঁয়াশার কোন সুরাহা এখনো হয় নি।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কারণে জাতীয় আয়ের হিসাবে যথোপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার না করায় প্রকৃত অবস্থা আড়ালে থেকে যাচ্ছে। যেমন, মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে গড় পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থনৈতিক অসমতাকে কার্পেটের নিচে রেখে দেওয়া হচ্ছে। দুই ব্যক্তির একজনের আয় যদি ১০ টাকা হয় এবং আরেকজনের ১০০ টাকা, তাহলে তাদের গড় মাথাপিছু আয় হবে ৫৫ টাকা। অথবা বিল গেটস বা মুকেশ আম্বানিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিলে জনগণের মাথাপিছু আয়ের অসম্ভব রকম উল্লম্ফন ঘটবে। বড় ধরনের অর্থনৈতিক অসমতা এই গড় হিসাবের মারপ্যাঁচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ "মধ্যক" নির্ণয়ের মাধ্যমে এই সমস্যার একটি সমাধানে পৌঁছানো যেত। ধরা যাক, একটি পাড়ায় পাঁচ জন লোকের ব্যক্তিগত আয় ৫ টাকা, ১৫ টাকা, ১৩ টাকা, ১০ টাকা এবং ৭ টাকা। এক্ষেত্রে বড় মানের সংখ্যাগুলোর স্থান হবে উপরের দিকে এবং ছোট মানের সংখ্যাগুলোর স্থান হবে নিচের দিকে। এই মানক্রমে কেন্দ্রের সংখ্যাটি হবে মধ্যক। অর্থাৎ ক্রমটি ১৫, ১৩, ১০, ৭ ও ৫ হবে। কেন্দ্রীয় সংখ্যাটি ১০ এবং এটিই মধ্যক। মাথাপিছু আয় এভাবে নির্ণয় করলে প্রকৃত তথ্য কিছুটা হলেও জানা যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মধ্যকের নিচে অবস্থিত মানুষকেই দরিদ্র বলা হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত ১দশমিক২৫ পিপিপি ডলারের দারিদ্র্য পরিমাপের হিসাব নিম্ন-মধ্যম আয়ের স্লোগানের সঙ্গে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

গত শতাব্দীর আশির দশক থেকেই জনমানুষ গ্রাম থেকে শহরে ও বিদেশে শ্রমিক হিসেবে গেছে। আয়ের প্রায় পুরোটাই গ্রামে পাঠিয়েছেন, দারিদ্র্য কমেছে এবং ভোগ ব্যয় বেড়েছে। ভোগ ব্যয় বাড়ায় জিডিপি'র পরিসর বেড়েছে। এখানে সাম্প্রতিক সরকারের নীতি, কৌশলের তেমন ভূমিকা নেই। এটাকে 'অটো পাইলট' প্রবৃদ্ধি বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকারের সঙ্গে অভিবাসী আয় থেকে সৃষ্ট ভোগের অনুপাত বেশ আয়তনবিশিষ্ট হওয়ায় সরকারি কোন ইতিবাচক নীতিগত হস্তক্ষেপ না থাকলেও বাংলাদেশে ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি জায়মান থাকবে।

ভারতের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অরবিন্দ সুব্রামানিয়াম সম্প্রতি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ভারতে জিডিপি'র প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার সরকারি হিসাব থেকে ২দশমিক ৫ শতাংশ কম (সুব্রামানিয়াম, ২০১৯)। সরকারি হিসাবে ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ সময় ভারতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৭ শতাংশ। গবেষণায় উঠে এসেছে, এই সময় প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। বাংলাদেশেও যদি এ ধরনের গবেষণা চালানো হয় তবে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার সরকারি হিসাব থেকে একই হারে কমে ৪ থেকে ৫ শতাংশের মতো পাওয়া যাবে। এখানেও পূর্ণাঙ্গ ডাটাসেট প্রকাশ করে গবেষণার সুযোগ দিলে জাতীয় আয় হিসাবের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে।

২.২: কোন ধরনের, কী পথে ও কার জন্য প্রবৃদ্ধি?

পরিমাণগত নয়, প্রবৃদ্ধির গুণগত মান এবং রূপান্তর যোগ্যতা নিয়েই আলোচনা করা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ, বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ বাড়লেও ঝরে পড়ার সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো'র (ব্যানবেইস) প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাধ্যমিকস্তরে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার আড়াই শতাংশ বেড়ে ৩৬ দশমিক ০১ শতাংশ হয়েছে। ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার সামান্য পরিমাণে কমলেও ৪০ দশমিক ১৯ শতাংশে স্থবির হয়ে আছে। আবার জিপিএ ৫ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও দক্ষতা বাড়ছে না বিধায় বিদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক আনতে হচ্ছে। কত কষ্ট করে বাংলাদেশিরা ১৬ বিলিয়ন ডলার পাঠানোয় গ্রামীণ অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এদিকে ছয় বিলিয়ন ডলারেরও বেশি চলে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা বলা হলেও বাংলাদেশ প্রযুক্তিখাতে নিরেট আমদানি নির্ভরই রয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দালানকোঠার জন্য বরাদ্দ জারি আছে, এখন দরকার গবেষণা ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়াস। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হলে শিক্ষিত বেকারত্বের বোঝা ব্যাপক কমে যাবে। দক্ষতা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের বাইরেও নাগরিক তৈরি শিক্ষার মৌলিক কাজ। কলা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম ছাড়া মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। চিকিৎসা সেবা নিম্ন আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানে রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। স্বাস্থ্যখাতে কোন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও নাই।

প্রশ্ন করা দরকার, জনজীবনে প্রবৃদ্ধি কী রূপান্তরিত পরিবর্তন আনছে? বাংলাদেশে দারিদ্র্যহ্রাস বড় চ্যালেঞ্জ। 'প্রবৃদ্ধি হবে, তারপর চুইয়ে পড়ে দারিদ্র্য বিমোচিত হবে' এ কৌশলের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে 'শূন্য দারিদ্র্য' অর্জন হবে না। ইতোমধ্যে দারিদ্র্য কমার হার কমেছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর দারিদ্র্য কমার হার ছিল ১দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে এ হার কমে ১দশমিক ২ শতাংশে নেমেছে। এ তথ্য আরও নিশ্চিত করে, এখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে হারে বাড়ছে বলে দাবি করা হচ্ছে, দারিদ্র্য সে হারে কমছে না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাস করতে সক্ষম কিনা- দারিদ্র্যের আয় স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে বোঝা যায়। 'উন্নয়ন অন্বেষণ'-এর গবেষণা অনুযায়ী, ২০০৫-২০১৬ সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ায় বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসের হারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের হার তুলনামূলক কম। ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য সীমা ১ দশমিক ৯০ ডলারে হালনাগাদ করেছে। নিম্নমধ্যম থেকে মধ্যম আয়ে রূপান্তর প্রত্যাশী একটি দেশের জন্য এ সীমা ন্যূনতম ৩ দশমিক ২০ ডলারের কম কি যুক্তিযুক্ত?

সঙ্গত প্রশ্ন - কী উপায়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে? চলমান কর্মসংস্থান তৈরীবিহীন প্রবৃদ্ধি? হিসাব মতে, বর্তমানে ৪ কোটি ৮২ লাখের মত তরুণ বেকার। তাহলে 'জনমিতিক লভ্যাংশ' অর্জন না করতে পারায় একটি প্রজন্ম কি হারিয়ে যাবে? ধরে নেয়া হচ্ছে, প্রবৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মশূন্য প্রবৃদ্ধিও গেছে। তথ্য বলছে, কর্ম সৃষ্টিকারী প্রবৃদ্ধি কৌশলের দিকে যেতে হবে। তাহলে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস রোধ করতে হবে। শিল্পখাতের খাতের পরিমাণ বাড়ছে না ও বহুমুখীকরণ হচ্ছে না। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, গত ছয় বছরে শিল্প-কারখানার সংখ্যাও বাড়ে নাই, কমেছে ৬০৮ টি। অটোমেশন আসবে, অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমবে, তাহলে দক্ষতা যেমন বাড়াতে হবে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সামর্থ্য নতুন শ্রমঘন শিল্প স্থাপনাও লাগবে।

কার জন্য প্রবৃদ্ধি - নিঃসন্দেহে সর্বজনের জন্য না হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। কিন্তু সরকারি সংরক্ষণশীল হিসাবও বলছে দিন দিন অসমতা ও বৈষম্য বাড়ছে। আয়, স্থানিক, লিঙ্গীয়, সম্পদ, সুযোগ ও ক্ষমতার বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে জারি থাকা কৌশলগুলোই অসমতা তৈরী করছে। বিশেষ করে ক্ষমতা, সুযোগ এবং সম্পদের বৈষম্য রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। অপরদিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদি সম্পদ ও সুযোগের বৈষম্য নাশ না করে, সমাজ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। ফলে অপরাধ প্রবণতা ও নৈরাজ্য বেড়ে যায়। ক্ষমতাহীন মানুষের ওপর অভিঘাত বেশি পড়ে। পত্রিকাগুলো থেকে জানা যায়, পাঁচ বছরে (২০১৪-২০১৮) ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা এবং ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হয়েছে প্রায় ৪ হাজার নারী ও শিশু। ২০১৮ সালে ২৮ প্রতিবন্ধী শিশুসহ ৫৭১ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ২৩৩জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ সংখ্যাগুলো নথিভূক্ত মামলা থেকে প্রাপ্ত। প্রায়শই সামাজিক মান-মর্যাদা রক্ষা ও অপরাধীর হুমকির ভয়ে নিপীড়িতের পরিবার নির্যাতনের বিষয়ে মুখ খোলে না।

রাজনৈতিক পরিসর, রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর এবং অংশগ্রহণ সংকুচিত হলে বৈষম্য আরও বাড়ে। যেমন ঋণখেলাপির সংখ্যা বেড়েই চলছে। জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকায় ঋণখেলাপিদের পোষা হচ্ছে জনগণের করের টাকায়।

প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার দেখিয়ে রাজনৈতিক বাহবা অর্জন গতানুগতিক প্রবণতা। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী লাভ দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের জয়ের আনন্দে 'গো টাইগার গো' বলতে শোনা গেলেও আসল বাঘের আবাসস্থল ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা তো সকলেরই জানা। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে মাত্র ১০ কিলোমটার দূরে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা। গবেষণায় দেখা গেছে, ৫০ বছরের মধ্যেই সুন্দরবনের বাঘ বিলুপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলোকে প্রতিবেশ বা পরিবেশগত বিষয় হিসাবে বাক্সবন্দি করলে চলবে না। দীর্ঘমেয়াদে ভাবতে হবে। জৈব এবং অজৈব উভয় ধরণের ভারসাম্য রক্ষা করা না গেলে স্থিতিশীল, টেকসই ও বজায়মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩. রাজস্ব আয়-ব্যয়ে ভারসাম্যহীনতা

সাম্প্রতিককালের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর আদায়ের পরিমাণ যেমন কম তেমনি করের আওতাও বাড়েনি। ফলে অন্যান্য বছরের মত গতবছরের জুনে ঘোষিত এ বছরের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না বিধায় সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ঘোষিত ও সংশোধিত বাজেটের কর আদায়ের পরিমাণের মধ্যে উল্লেযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৪০ হাজার ১০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে রাজস্ব কর আদায় হয়েছে মাত্র ১ লাখ ৯৪ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা।

সারণী ২: রাজস্ব আয় ও ব্যয় (কোটি টাকা)

	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত বাজেট ২০১৭-১৮
রাজস্ব এবং বৈদেশিক অনুদান				
রাজস্ব	৩,৭৭,৮১০	৩,১৬,৬১২	৩,৩৯,২৮০	২,১৬,৫৫৬
কর রাজস্ব	৩,৪০,১০০	২,৮৯,৬০০	৩,০৫,৯২৭	১,৯৪,৩২৭
এনবিআর কর রাজস্ব	৩,২৫,৬০০	২,৮০,৩০০	২,৯৬,২০১	১,৮৭,১০৩
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	১৪,৫০০	৯,৬০০	৯,৭২৭	৭,২২৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৩৭,৭১০	২৭,০১৩	৩৩,৩৫২	২২,২২৯
বৈদেশিক অনুদান	৪,১৬৮	৩,৭৮৭	৪,০৫১	৮৬৮
ব্যয়				
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৩,১০,২৬২	২,৬৬,৭২৮	২,৮২,৪১৫	১,৯১,৪৭৩
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	২,৭৭,৯৩৪	২,৪৭,৭৪৭	২,৫১,৬৬৮	১,৭৮,৮৭৯
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৫২,৭৯৭	৪৫,২৭৮	৪৮,৩৭৭	৩৮,১৬০
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৪,২৭৩	৩,৪৬৭	২,৯৬৩	৩,৬০৫
মূলধনী ব্যয়	৩২,৩২৮	১৮,৯৮১	৩০,৭৪৭	১২,৫৯৩
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	-১,৪১,২১২	-১,২২,২৪২	-১,২১,২৪২	-১,০৪,৪৩৮
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-১,৪৫,৩৮০	-১,২৫,৯২৯	-১,২৫,২৯৩	-১,০৫,৩০৬

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৯

২০১৯-২০ অর্থবছরের ঘোষিত লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব কর আদায় বাড়াতে হবে ৭৫ শতাংশ (সারণী ২), অতীত অভিজ্ঞতা বলে যা কখনও সম্ভব নয়। ২০১৮-১৯ সালেও কর থেকে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৫ হাজার ৯২৮ কোটি টাকা। তারমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর কর্তৃক মোট রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২ লাখ ৯৬ হাজার ২০১ কোটি টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রা সংশোধিত হয়ে ২ লাখ ৩ হাজার ৮৪৪ দশমিক ৭৮ কোটি টাকা হলেও এনবিআর জানাচ্ছে, এ বছরের মার্চ নাগাদ ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮৪৯ দশমিক ৮৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। অন্যদিকে একই অর্থবছরে এনবিআর বহির্ভূত করের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা। অতীত অভিজ্ঞতা বলে এ লক্ষ্যমাত্রাও অর্জন সম্ভব হবে না।

মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ করদাতা। প্রতিবেশি দেশে অপেক্ষাকৃত কম হলেও করদাতার পরিমাণ প্রায় ১৮ শতাংশের মতো। পরিসংখ্যান বলছে, সামর্থ্যবান মানুষের ৬৮ শতাংশই করের আওতায় নেই। জাতীয় আয় বাড়লে করদাতার সংখ্যা আরও বাড়ার কথা। আয়করের পরিধি বাড়ছে না। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় কর-জিডিপি হারও কম। গত দশ বছরে বাংলাদেশে গড় কর-জিডিপি অনুপাত ১০দশমিক ৩ শতাংশ যেখানে ভারত ও নেপালে ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ। উন্নত দেশগুলোতে এর পরিমাণ ৩৫দশমিক ৮ শতাংশ।

আইএমএফের পাঁচ বছরের কর-জিডিপির হার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঁচ বছরের গড় কর-জিডিপি অনুপাতে নেপালের ২৩ দশমিক ৩, ভারতের ২০ দশমিক ৩, পাকিস্তানের ১৫ দশমিক ২ এবং শ্রীলংকার ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ। এমনকি সাব-সাহারা আফ্রিকার দেশগুলোকে কর-জিডিপি হার গত পাঁচ বছরে ছিল ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ। যেখানে ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বাংলাদেশে গড় কর-জিডিপির হার ছিল ১০ দশমিক ২ শতাংশ।

জাতীয় আয়ের যে প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়, তার সঙ্গে বাংলাদেশের কর-জিডিপির অনুপাত সঙ্গতিহীন। একদিকে কর আদায় ঠিকমত হচ্ছে না অপরদিকে টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে। ঋণখেলাপিদের সুবিধা দেয়ার প্রয়াস বিদ্যমান। দেশের সাধারণ করদাতারাই ঋণ শোধ ও উন্নয়নের মূল উৎস হিসেবে কাজ করছেন। বারবার বলা হলেও আয়কর এখনও কর আদায়ের প্রধান উৎস নয়। মোট জনসংখ্যার মাত্র ২দশমিক ১ মিলিয়ন আয়কর দেয়। মূল্য সংযোজন করের মাধ্যমেই ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে । এই আয়-নিরপেক্ষ পরোক্ষ করের বোঝা পুরোটাই সাধারণ জনগণের কাঁধে চেপে বসে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগণের উপর করের ভার বর্তাচ্ছে। বিপরীতদিকে উচ্চবিত্তদের কর পরিহার ও ফাঁকি দেয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে! ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাস্তবায়িত বাজেটে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ছিল ২৩ হাজার ৭৮ কোটি টাকা। এ অর্থবছরের বাজেট পরিকল্পনায় ভ্যাটের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৯ বছরে ভ্যাটের হার প্রায় ৩৮০ শতাংশ বেড়েছে! ভ্যাট সরকারের কাছে সোনার ডিম পাড়া হাঁস! বারবার বলা হলেও আয়করের পরিধি বাড়ছে না। এ প্রক্রিয়ায় কর ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল (রিগ্রেসিভ) হয়েছে।

ঘোষিত বাজেটে ভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর কর বাড়ানোর ফলে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের ওপর চাপ আরও বাড়বে। ৫টি মৌলিক চাহিদার তিনটিতেই চাপ বেড়েছে। করমুক্ত আয়ের সীমা না বাড়ানো, টেলিফোনে কথা বলার ওপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি, পোশাকে ভ্যাট বাড়ানো এবং খাদ্যপণ্যে ট্যারিফ মূল্য বিলুপ্তির ঘোষণা করা হয়েছে। মোবাইল ফোনে কথা বলার ওপর সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এতে মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ বাড়বে। নিত্যব্যবহার্য পোশাকের ওপর ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে। কেউ পোশাক কিনলে চলতি অর্থবছরে মোট দামের ৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে তা আরও আড়াই শতাংশ বাড়িয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হয়েছে। এ ছাড়া পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে দর্জির দোকানের মূল্য পরিশোধের ওপর নতুন করে ১০ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। ফলে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তরা ব্যাপক চাপে পড়বে।

জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে নিদারুণ সংগ্রামে নিমজ্জিত হতে হবে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়লেও গত তিন বছরের মত করমুক্ত আয়ের সীমা একই স্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। এতে মাসে মাসে ২০ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকা আয় থাকলেই ব্যক্তিকে সরকারী কোষাগারে করের অর্থ প্রদান করতে হবে। এছাড়া নতুন পুরনো সব ধরনের সঞ্চয়পত্রেই মুনাফার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ উৎস কর আরোপ করা হয়েছে। এতে করে সমস্যায় পড়বে মধ্যবিত্তরা। কেননা সঞ্চয়পত্রের বড় অংশ উচ্চবিত্তরা কিনে রাখায় টাকা দেবার মূল দায়টা বহন করতে হবে এই শ্রেণীকেই।

বাজেট ঘোষণার কিছুদিন পরেই গ্যাসের দাম বাড়ানোর কথা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। বহির্বিশ্বের বাজারে গ্যাসের দাম কম থাকলেও দেশীয় বাজারে গ্যাসের দাম বেড়ে চলেছে চক্রবৃদ্ধি হারে। এই সময়কালে বিশ্ববাজারে গ্যাসের মূল্য কমেছে শতকরা ৫০ ভাগ। ভারত সম্প্রতি তাদের ভোক্তাদের জন্য গ্যাসের মূল্য কমিয়েছে ১০১ রূপি। এর ফলে গ্যাসনির্ভর শিল্পগুলোর উৎপাদন খরচ বাড়বে। এর ফলে মুনাফা হারাবে কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। স্বাভাবিকভাবেই বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ মানুষের দুর্দশাও চরমে উঠবে।

আবার সাধারণ জনগণকে বড় ঋণখেলাপিদের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে । গত কয়েক বছরে সরকারি ব্যাংকের মূলধন সংকট মেটাতে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা কর থেকে দেয়া হয়েছে। সাধারণ জনগণ করের বোঝা বহন করে চললেও এর বিনিময়ে জনসেবা পাওয়ার চিত্র হতাশাজনক। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে গুণগত উন্নয়ন প্রশ্নের সম্মুখীন। এছাড়াও নিরাপদ সুপেয় পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সহ অন্যান্য জনসেবামূলক কর্মকান্ড মন্থর গতিতে এগুচ্ছে।

ব্যয় বাড়ছে। কিন্তু আয় বাড়ছে না। ফলে বাজেটে প্রতিবছরই ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ বাজেটে ঘাটতি ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মেটাতে ঋণ নিতে হচ্ছে। বর্তমানে মাথাপিছু ঋণ ৬৭ হাজার টাকা। ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে সুদ-আসল পরিশোধ করতেই বিশাল ব্যয় হচ্ছে। বাজেট বরাদ্দের তৃতীয় সর্বোচ্চ খাত এখন ঋণের সুদাসল পরিশোধ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এখাতে রাজস্ব ব্যয়ের ১৮ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ফলে দেশের গুণগত সার্বিক রূপান্তরে অত্যধিক প্রয়োজনীয় মানবপুঁজি বা দক্ষ শ্রমশক্তি বিনির্মাণে তথা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে না। উপরন্তু ঋণের পরিমাণ সুদসহ জমতে জমতে পাহাড়সম হলে পরিশোধের কোন দিকনির্দেশনাও বাজেটগুলোতে নাই।

সারণী ৩: অর্থ সরবরাহ (কোটি টাকা)

	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত বাজেট ২০১৭-১৮
বৈদেশিক ঋণ-নিট	৬৩,৮৪৮	৪৩,৩৯৭	৫০,০১৬	২৫,৬২১
বৈদেশিক ঋণ	৭৫,৩৯০	৫৩,৮৮৩	৬০,৫৮৫	৩৩,১৩২
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-১১,৫৪২	-১০,৪৮৬	-১০,৫৬৯	-৭,৫১২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৭৭,৩৬৩	৭৮,৭৪৫	৭১,২২৬	৭৮,৮১৫
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নিট)	৪৭,৩৬৪	৩০,৮৯৫	৪২,০২৯	১১,৭৩১
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	২৮,০৯৪	২১,১১৭	২৩,৯৬৫	৬,১৭১
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট)	১৯,২৭০	৯,৭৭৮	১৮,০৬৪	৫,৫৬০

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৯

বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার পরিকল্পনা পেশ করেছে। অন্যদিকে বেশিরভাগ ব্যাংকে তারল্য সংকট চলছে। ব্যাংক থেকে এত টাকা সরকার নিয়ে নিলে বেসরকারি খাতের জন্য খুব কমই অবশিষ্ট থাকবে। বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেও অর্থ ধার করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নতুন টাকা ছাপাতে হবে। এতে মূল্যস্ফীতি বাড়বে।

বাজেট ঘাটতি মেনে নেয়া যায়, যদি তা অর্থনীতিতে গুণক প্রভাব তৈরি করে। ঋণ বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ সরকারি চাকুরীতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও গণহারে পদোন্নতির মাধ্যমে বেতন কাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেতন-ভাতার জন্য রাজস্ব ব্যয়ের ২০দশমিক ৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ বাজেটে জনপ্রশাসনেই বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৮দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকার ১৮দশমিক ৫ টাকাই খরচ হবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতায়। এর সঙ্গে পেনশনের ব্যয় যোগ করলে দাঁড়াবে ২৮ টাকার মতো। অতিরিক্ত পদ-পদবি সৃষ্টির মাধ্যমে এই খাতে খরচ বাড়ছেই। উপসচিবের ৮৫০টি পদের বিপরীতে ১ হাজার ৫৫৪ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। যুগ্ম সচিবের ৪৫০টি পদের বিপরীতে ৭৮৭ জন, অতিরিক্ত সচিবের শতাধিক পদের বিপরীতে ৪৩৫ জন কর্মরত আছেন। এরসঙ্গে যোগ হয়েছে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। ২০১৭ সালে বিভিন্ন সংস্থায় ১৪২ জন কর্মকর্তা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে কর্মরতদের মধ্যে ১২ জন সচিবকে অবসরের পর পুনরায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়।

সারণী ৪: বিভিন্ন খাতে সম্পদ বরাদ্দ (%)

খাতসমূহ	রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়	রাজস্ব ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয়
স্বাস্থ্য	৪.৯	৪.৩	৫.৮
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৫.২	১৩.২	১৮.১
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৫.৬	৬.৫	২.৭
কৃষি	৫.৪	২.৬	৫.৪
জনপ্রশাসন	১৮.৫	৯.৮	৬.১
ঋণের সুদ	১০.৯	১৮.৩	
পরিবহন ও যোগাযোগ	১২.৪	২.৭	২৬.১
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭.২	১.৭	১৫.৪
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৫.৩	৭.২	-
প্রতিরক্ষা	৬.১	৮.৭	-
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	৫.৪	-	১৩.২

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৯

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত ব্যয় কতটা গুণসম্পন্ন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বারবার সংশোধনের ফলে ঋণের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে অস্বাভাবিক খরচও চোখে পড়ার মত। সম্প্রতি রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে অনিয়মের খবর জনসমক্ষে এসেছে। বিভিন্ন প্রকল্পে কোন পর্যায়ের দুর্নীতি হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া অর্থবছর শেষে জোড়াতালি দিয়ে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯০-৯২ শতাংশ দেখানো হয় যা প্রথম ১০ মাসের হিসাবের সঙ্গে কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৪. বৈদেশিক লেনদেন স্থিতির ভারসাম্যহীনতা

চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি লক্ষণীয়। গত দুই বছর ধরে রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের শ্লথ গতি এবং আমদানি ব্যয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ব্যাপক চাপ তৈরি করে চলেছে। যেমন চলমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের ফারাক বাড়ায় ১৩ হাজার ৫৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে। প্রবাসী আয়েও মন্দাভাব লক্ষণীয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই- এপ্রিল সময়ে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় সামান্য বাড়লেও (১৩,৩০৩ মিলিয়ন ডলার) গত কয়েক বছর প্রবাসী আয়ের প্রবাহে উঠানামা উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। ফলে চলতি হিসাবে ৫হাজার ০৬৫ মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি।

সরকারি তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানির জন্য ব্যয় বাড়ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিবেদন জানান দিচ্ছে, আমদানির আড়ালে পণ্যমূল্য বেশি ঘোষণার মাধ্যমে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হচ্ছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র সর্বশেষ হিসাবে ২০০৬-২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ থেকে ৫ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। প্রতিবছর এ হার বেড়েই চলেছে। যেমন ২০১৩-১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে আমদানিকৃত চালের মূল্য টনপ্রতি ৮০০ থেকে ১ হাজার ডলার ছিল। অথচ এ সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের গড় মূল্য ছিল টনপ্রতি প্রায় ৫০০ ডলার ছিল। অবৈধ পন্থায় অর্জিত হলে বা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে অর্থ পাচার বাড়ে।

বর্তমানে আর্থিক হিসাবে ঘাটতি না দেখা গেলেও এটি নিয়ে আলোচনা দরকার। আর্থিক হিসাবের অন্যতম উপাদান- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য নয় এবং উঠানামাও নাই। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ গত অর্থবছরের চেয়ে এ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়কালে কিছুটা বাড়লেও কয়েক বছর ধরে এর পরিমাণ ২দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছিই আটকে আছে। কিন্তু পুঁজিবাজারে ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে। পুঁজিবাজারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ ২২দশমিক ৯৪ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আগের অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিলে ১৬দশমিক৩০ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ঋণের পারিমাণও বেড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় বড় অবকাঠামোর জন্য ঋণ নেয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, বড় প্রকল্পগুলোর সময়ও বেড়েই চলছে। ফলে প্রকল্প খরচও হু হু করে বাড়ছে। অধিক খরচ জোগান দিতে বৈদেশিক ঋণের প্রবাহও বাড়ছে। গুণগত মান নিয়ে প্রশ্নও রয়েছে।

সারণী ৫: বৈদেশিক লেনদেন ও ভারসাম্যের কিছু উপাদান (মিলিয়ন ইউএস ডলার)

	২০১৭-১৮ (জুলাই-এপ্রিল)	২০১৮-১৯ (জুলাই-মার্চ)	২০১৮-১৯ (জুলাই-এপ্রিল)
বাণিজ্য ভারসাম্য	-১৫২৬৯	-১১৯২৭	-১৩৬৭৫
রপ্তানি	৩০০৭৭	৩০৪৪০	৩৩৪৩০
আমদানি	৪৫৩৪৬	৪২৩৬৭	৪৭১০৫
রেমিট্যান্স প্রবাহ	১২০৯২	১১৮৬৯	১৩৩০৩
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-৭৭৯৩	-৪২৪৬	-৫০৬৫
মূলধনী হিসাব	২৬১	১৮৮	২১২
আর্থিক হিসাব	৬৯৯৪	৪৩০৬	৪৭৬৫
সরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগ (স্থূল প্রবাহ)	২৪৮৪	২৮৯৭	৩১৪৫
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (নিট)	৩৪৪	১৪৭	১৪৬
অন্যান্য বিনিয়োগ (নিট)	৫৩৪৩	২৮২০	৩১৩৮
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	৪০১৩	৪৩১৪	৪৬৬৭
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	১৭৯	৯০৬	১০৩২
অন্যান্য স্বল্পময়াদি ঋণ (নিট)	১৩৭২	১০১৮	৯৬৩
সার্বিক লেনদেনের ভ্যারসাম্য	-১০৪৪	-৩২৬	-৫৯০
মোট রিজার্ভ (মূল্য সংযোজনের পর)	৩৩১০৯	৩১৭৫৩	৩২১২৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৯

সার্বিক লেনদেনের স্থিতিপত্রে ঋণের প্রবাহ জমা ও দেনা পরিশোধ খরচ হিসাবে দেখান হয়। যেসময়ে ঋণের অন্তস্থ প্রবাহের পরিমাণ বেশি ও দেনাশোধের পরিমাণ কম, উক্ত সময়ে হিসাবগত উদ্বৃত্ত দেখা যাবে। যদিও তা সাময়িক। ঋণ সুদাসল পরিশোধ শুরু হলেই এ স্থিতি ঋণাত্বক হিসাবে খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এ জন্যেই ঋণকে আর্থিক দায়ও বলা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ২০১৮-১৯ বছরের জুলাই- মার্চ সময়কালে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ৩১৪ মিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ৩ হাজার ২২০ মিলিয়ন ডলার ছিল। ৩৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ বেড়েছে। অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আগের অর্থবছরের একই সময়ের ১৬১ মিলিয়ন থেকে একই রকমের উল্লম্ফন দিয়ে এবছরে ১ হাজার ০০৫ মিলিয়ন ডলার হয়েছে। গত ৯ মাসে সরকার ৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণ নিয়েছে যেখানে আগের বছর একই সময় এই পরিমাণ ছিল ৩ দশমিক ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। এ সময়কালে ঋণপরিশোধের হার আগের বছরের তুলনায় কম। আর্থিক লেনদেন স্থিতিতে বিশাল পরিমাণের হিসাবিক উদ্বৃত্ত থাকায় চলতি হিসাবের বিরাট ঘাটতি থাকলেও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে বড় ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে এখন যে হারে ঋণ আসছে তা এখনই পরিশোধ করা হচ্ছে না। এ কারণে আর্থিক হিসাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যখন শোধ করা শুরু হবে তখন সমস্যা দেখা দেবে। এ ঋণ পরিশোধ করতে যেয়ে সামগ্রিক অর্থনীতি চাপের মুখে পড়বে এবং স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। অত্যধিক ঋণ নেয়ার মাধ্যমে অর্থনীতি ক্রমাগত একটি ঋণচক্রজালে জড়িয়ে পড়ছে। এই জাল থেকে বের হওয়া অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হবে। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ এরকম ঋণভারে জর্জরিত হয়ে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। সম্প্রতি ঋণভারাক্রান্ত শ্রীলঙ্কা হাম্বানটোটা বন্দর চীনের কাছে ইজারা দিয়েছে অথবা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য একটি দেশ পাকিস্তানের মত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের দ্বারস্থ হতে হবে। আট বছর আগে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ বহুধা শর্তযুক্ত আইএমএফের বর্ধিত ঋণ সুবিধার আওতায় যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ২০১৭ অর্থবছর থেকে ক্রমহ্রাসমান। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রিজার্ভের পরিমাণ ৩১ হাজার ৭৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের একই সময়ে সামান্য বেড়ে ৩২,১২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। বাজারে ডলার সংকটের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে ডলার সরবরাহ করছে। বৃহৎ প্রকল্পগুলোতে ডলারের ব্যবহারের কারণে ব্যবসায়ীরা ডলার পাচ্ছে না। এলসি খুলতে না পারায় সামগ্রিক বৈদেশিক লেনদেন অস্বস্তিদায়ক অবস্থায় পড়েছে। আবার বিদেশী ঋণের সুদের হারও বাড়তির দিকে। ঋণ পরিশোধ করতে ডলারের ওপর আরও চাপ বাড়বে। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যে ঋণ নেয়া হয়েছে সেগুলোর সুদাসল শোধ করা শুরু হলে ঘাটতি আরও বাড়বে।

৫. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে গুণগত মানের অবনতি

শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো খাত সবচেয়ে অবহেলিত। অবকাঠামোতে খরচ বাড়লেও গুণগত মান কমছে । বিদেশ থেকে জনশক্তি আনতে হচ্ছে। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানা যাচ্ছে, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারত প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার অভিবাসী আয় হিসেবে পেয়েছে। ব্যক্তিপ্রতি স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার খরচ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে ব্যক্তিপ্রতি স্বাস্থ্যখাতে খরচ মোট খরচের ৬৭ শতাংশ। সেখানে ভারত ৬২, পাকিস্তান ৫৬, নেপাল ৪৭, ভুটান ২৫ ও মালদ্বীপ ১৮ শতাংশ । খরচ বেড়েছে, মান বাড়ে নাই। এটিই দেশের স্বাস্থ্য খাতের মৌলিক সমস্যা।

একদিকে বাজেটে বরাদ্দ কম অপরদিকে গুণগত মানও বাড়ার কোন লক্ষণ নাই। শিক্ষা ও গবেষণার বর্তমান অবস্থার সাথে কর্মসংস্থানের বর্তমান চালচিত্র সহজেই মেলানো যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে একযোগে রাজস্ব ব্যয়ের ১৩দশমিক ২ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ৬১ হাজার ১১৮ কোটি টাকা যা জিডিপির মাত্র ২দশমিক ১ শতাংশ। জিডিপির অনুপাতে শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের ব্যয় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০১৬-১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, এ

খাতে ভারত ৩ দশমিক ০৮, পাকিস্তান ২ দশমিক ৭৬, আফগানিস্তান ৩ দশমিক ৯৩, মালদ্বীপ ৪ দশমিক ২৫, নেপাল ৫ দশমিক ১০, শ্রীলঙ্কা ২ দশমিক ৮১ শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশে ২০১৬-১৭ সালে বরাদ্দ ছিল মাত্র জিডিপির ১দশমিক ৫৪ শতাংশ।

চিকিৎসা খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের মাত্র ৪.৩ শতাংশ। এই বছরের বাজেটেই এই হার কম। বিভিন্ন সূচকে এই খাতের বর্তমান অবস্থা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (নিপোর্ট) জরিপ অনুযায়ী, দেশের মাতৃ মৃত্যুর হার এখন ১৯৬। নিপোর্টের হিসাব সঠিক ধরে নিলে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর পরিমাণ ২০১০ সালের ১৯৪ জন থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ১৯৬ জন হয়েছে। চিকিৎসা সেবা নিম্ন আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকারী স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মানে রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি।

শিক্ষা খাতের গুণগত মান বাড়ানোর কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে বাজেটে বিদেশ থেকে শিক্ষক আনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে বরং প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন না হয়ে বিদেশে রেমিটেন্স হিসেবে অর্থ চলে যাবে। আবার যে অল্প কিছু টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় তার অধিকাংশই খরচ হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়নে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা খাতের চ্যালেঞ্জ দু'ধরনের- ক. দক্ষতা বৃদ্ধি ও খ. জ্ঞান বিতরণ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়। ফলে দক্ষতায় যেমন দেশ পিছিয়ে পড়ছে তেমনি নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং বিতরণ ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবাকে এখনো সর্বজনীন করা যায়নি। রাষ্ট্র সকলের জন্য মানসম্মত সমান সেবার সুযোগ নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা পেতে নাভীঃশ্বাস উঠছে। অন্যদিকে ধনিক শ্রেণী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার জন্য বিদেশে ঝুঁকছে। দিন দিন এই প্রবণতা বেড়েই চলছে। প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে সর্বজনের করার জন্য কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। শিক্ষাখাতের বরাদ্দকে প্রযুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো হয়েছে। বরাবরের মতো এই দু'টি খাত অবহেলিত রয়ে গেছে। কিন্তু মানব সম্পদ তৈরী এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই।

৬. কৃষি ও শিল্প বহুমুখীকরণের চ্যালেঞ্জ

উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণে কৃষি খাতে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি বাড়ছে না। বিশেষত শস্য উৎপাদনে নেতিবাচক লক্ষণ স্পষ্ট। কৃষি খাতের হ্রাসমান প্রবৃদ্ধির কারণ হল: সবুজ বিপ্লবের পর এই খাতে প্রযুক্তির তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। আবার অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র এই ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষক অত্যধিক মূল্যে এইসব প্রযুক্তিসেবা কিনতে পারছে না। কৃষি জমি একদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হচ্ছে, অন্যদিকে এগুলোর উর্বরা শক্তিও কমছে। এই খাতে বাজেট বরাদ্দও সামান্য। আবার অধিকাংশ বরাদ্দই অনুন্নয়নশীল খাতে। ২০১৯-২০ বাজেটে মাত্র ৫দশমিক ৪ শতাংশ উন্নয়ন ধরা হয়েছে। এসব কারণে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

অন্যদিকে কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য প্রবল। বাজেটে কৃষকদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য তেমন প্রণোদনা নেই। যেসব প্রণোদনার প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলোতে প্রাথমিকভাবে লাভবান হবে আমদানিকারক এবং ব্যবসায়ীরা। অথচ দাবি ছিল ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ন্যূনতম কিছু আর্থিক সহায়তার। কৃষিখাত এখনও অধিকাংশ মানুষ নিয়োজিত থাকলেও বরাবরের মতো এবারও এ খাত অবহেলিতই থেকে গেছে।

আবার উৎপাদনশীল খাতের পরিমাণ বাড়ছে না ও বহুমুখীকরণ হচ্ছে না। এক খাতকেন্দ্রিক নির্ভরতা অর্থনীতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। তৈরি পোশাক শিল্পের বাইরে নতুন কোন নির্ভরযোগ্য উৎপাদনশীল খাত তৈরি হচ্ছে না। গত ছয় বছরে শিল্প-কারখানার সংখ্যাও বাড়ে নাই, কমেছে ৬০৮ টি। ২০১২ সালে বড় শিল্প-কারখানা ছিল ৩ হাজার ৬৩৯টি, ২০১৯ সালে সংখ্যা কমে ৩ হাজার ৩১টি হয়েছে। মাঝারি শিল্প কারখানা ৬ হাজার ১০৩ টি থেকে কমে ৩ হাজার ১৪টি হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানার সংখ্যাও কমেছে। শিল্পখাতে বর্তমানে ১ লাখ ২৯ হাজার জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

২০-২২ লাখ চাকুরীপ্রার্থী তরুণ-তরুণীর তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। মৌলিক সমস্যাগুলোর এরূপ প্রকটতার মুখ্য কারণ হল- প্রতিষ্ঠানগুলোর ভঙ্গুরতা, বিনিয়োগে আস্থাহীনতা ও পুঁজিপাচার।

বাজেটে পোশাক শিল্প খাতে প্রণোদনা হিসেবে ২ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিকল্প অন্য কোন খাতে উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা নেই। পোশাক-শিল্প খাতের প্রভাব বেশি থাকায় তারাই সুবিধা পাচ্ছে। বছরের পর বছর প্রভাবশালী খাতে প্রণোদনা দিয়ে শিল্প খাত এককেন্দ্রীকতার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ফলে অন্য কোন খাতের বিকাশ ঘটেনি। পণ্য রপ্তানি এবং শিল্পের বৈচিত্রকরণ এবং বহুমুখীকরণ করা না গেলে শিল্প খাত অদূর ভবিষ্যতে মুখ থুবড়ে পড়বে।

অন্যদিকে ঘোষিত বাজেটে প্রযুক্তিখাতও অবেহেলার মধ্যে রয়েছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে একযোগে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৫ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ। সামান্য বাড়লেও প্রযুক্তিখাতে প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দ নিতান্তই স্বল্প। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু প্রযুক্তি খাতকে পিছিয়ে রেখে তা কখনই সম্ভব নয়। বহুমুখী, বৈচিত্র্যপূর্ণ, টেকসই এবং স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিকল্প নেই।

৭. আর্থিক খাতের শাসন সংকট

ব্যাংক ব্যবস্থাপনার দৈন্যদশা সবার জানা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, অবলোপন করা ঋণসহ খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি। ২০০৯ সালের শুরুতে ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা (চিত্র ১)। পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের হার এখন সর্বোচ্চ, ১১ দশমিক ৮৭ শতাংশ। এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খেলাপি ঋণের হার কমে আসলেও বাংলাদেশে বেড়েই চলছে (চিত্র ২)। অর্থমন্ত্রীও অল্প সময়ের ব্যবধানে নানা রকম বিবৃতি দিয়েছেন। কখনও বলছেন, খেলাপি ঋণ আর বাড়বে না। পরমুহূর্তে আবার শর্ত শিথিলতার ঘোষণা দিয়ে বলছেন, ঋণখেলাপিদের জেলে দিলে দেশ চলবে না। 'প্রকৃত' ব্যবসায়ীদের সব সুযোগসুবিধাই দেওয়া হবে। এসব শর্ত প্রতিপালন করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান, তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তর্জাতিক মানদন্ড থেকে সরে আসছে।

চিত্র ১: খেলাপি ঋণ কোটি টাকা)

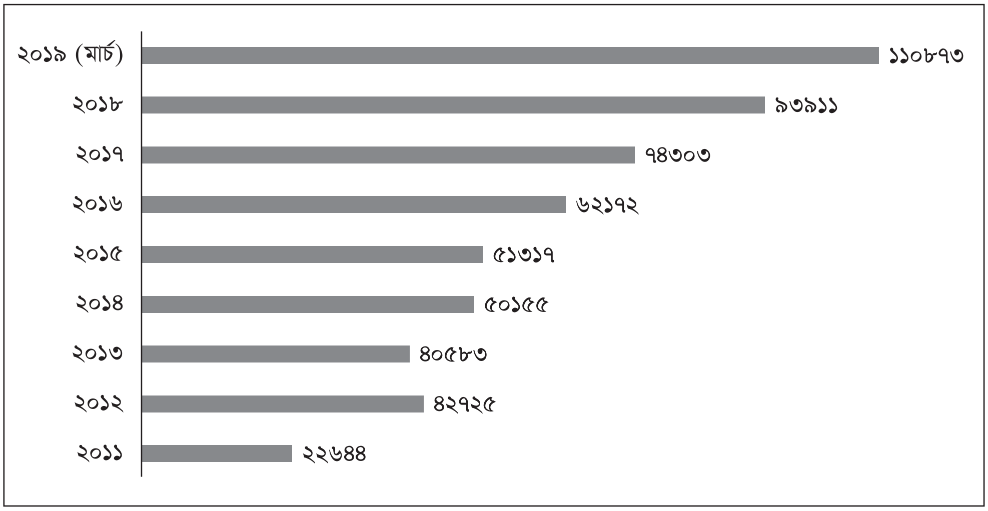

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৯

চিত্র ২: বিভিন্ন দেশে খেলাপি ঋণের হার

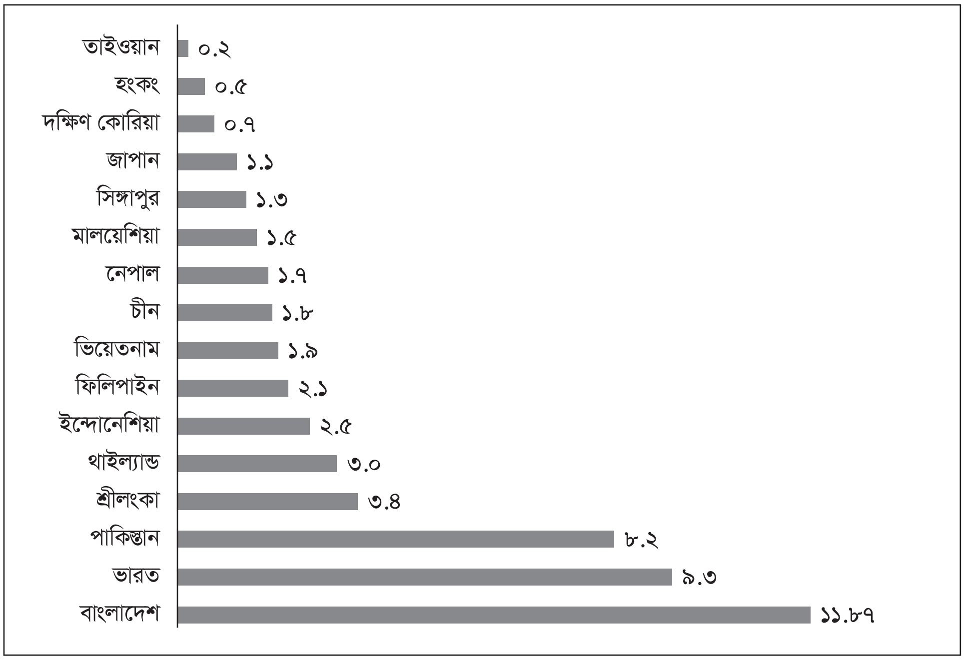

উৎস: আদনান, ২০১৯

রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০১৫ সালে বড় ঋণখেলাপিদের বিশেষ সুবিধা দিতে বড় অঙ্কের ঋণ পুনর্গঠনের নীতিমালা অনুমোদন দিয়েছে। এ পক্ষপাতমূলক সুবিধার আওতায় ৫০০ কোটি টাকা বা তার বেশি অঙ্কের ঋণেরই শুধু পুনর্গঠন করা যাবে। অর্থাৎ, নিয়ম পালনকারীরা বৈষম্যের শিকার হবেন। অন্যদিকে, খেলাপির অনন্ত সুযোগ-সুবিধা! নীতিমালা অনুসারে, মেয়াদি ঋণ পুনর্গঠন সর্বোচ্চ ১২ বছরের জন্য। আর তলবি ও চলমান ঋণ পুনর্গঠন হবে ছয় বছরের জন্য। ঋণের পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার কম হলে ডাউন পেমেন্ট বা এককালীন জমা দিতে হবে ২ শতাংশ হারে। আর এক হাজার কোটি টাকা ও তার বেশি পরিমাণ ঋণের জন্য এককালীন জমা দিতে হবে ১ শতাংশ হারে। পরিসংখ্যান বলছে, পুনর্গঠন-সুবিধা নিয়ে ব্যবসায়ীদের বড় অংশই কিস্তি পরিশোধ করেনি। ইতিমধ্যেই সুবিধাপ্রাপ্তরা নতুন করে খেলাপি হয়েছেন। রাজনৈতিক বিবেচনায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত নতুন ব্যাংকগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। ওগুলোরও খেলাপি ঋণ বেড়েছে। পত্রিকান্তরে পরিচালনা পর্ষদের নয়ছয়ের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এ বছরের নতুন পদক্ষেপ অনুযায়ী, ঋণখেলাপিরা ৯ শতাংশ সুদে ঋণ শোধ করতে পারবেন। অর্থাৎ যাঁরা ঋণ নিয়ে শোধ না করে ইচ্ছে করে খেলাপি হয়েছেন, তাঁরা ৯ শতাংশ সুদে ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন। ঘোষণা এলো, ঋণখেলাপিদের মাফ করে দেওয়া হবে। এখন আবার খেলাপি ঋণের সংজ্ঞায় পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করলে তবেই তা খেলাপি হবে, যা আগে ছিল তিন মাস। তবে আগের ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নীতিমালাটি ছিল আন্তর্জাতিক মানের। ঋণ অবলোপনের নীতিমালায় যে সংশোধন আনা হয়েছে, তাতে ব্যাংকগুলো এখন মাত্র তিন বছরের মন্দ মানের খেলাপি ঋণ ব্যালেন্স শিট থেকে বাদ দিতে পারবে। এত দিন কোনো ঋণ মন্দ মানে, শ্রেণীকৃত হওয়ার পাঁচ বছর পার না হলে তা অবলোপন করা যেত না। অন্যদিকে, অবলোপনের জন্য এখন আর আগের মতো শতভাগ প্রভিশন লাগবে না। আবার দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ অবলোপনে মামলা করতে হবে না। এত দিন মামলা না করে অবলোপন করা যেত ৫০ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা শিথিলের ফলে এক ধাক্কায় খেলাপি ঋণ আদায় না হলেও তা কাগজ-কলমে কমবে! এ সুবিধার ফলে ঋণখেলাপিরা ও দুর্বল ব্যাংকগুলো আরও উৎসাহিত হবে। এখন ভালো ঋণগ্রহীতারাও ঋণ শোধ না করে খেলাপি হতে চাইলে দায় কার!

৮. দারিদ্র্য ও অসমতা বৃদ্ধি

অসমতা বাড়ছে হু হু করে।২০১৬ সালে বৈষম্যপরিমাপকারী জিনি সূচক শূন্য দশমিক ৪৮ দাঁড়িয়েছে । ২০১০ সালে শূন্য দশমিক ৪৫৮ ছিল (চিত্র-৩)। বৈষম্য কমাতে অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ। অক্সফাম সূচকে বিশ্বের ১৫৭ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৮তম।

চিত্র ৩: আয় বৈষম্য (জিনি সহগ)

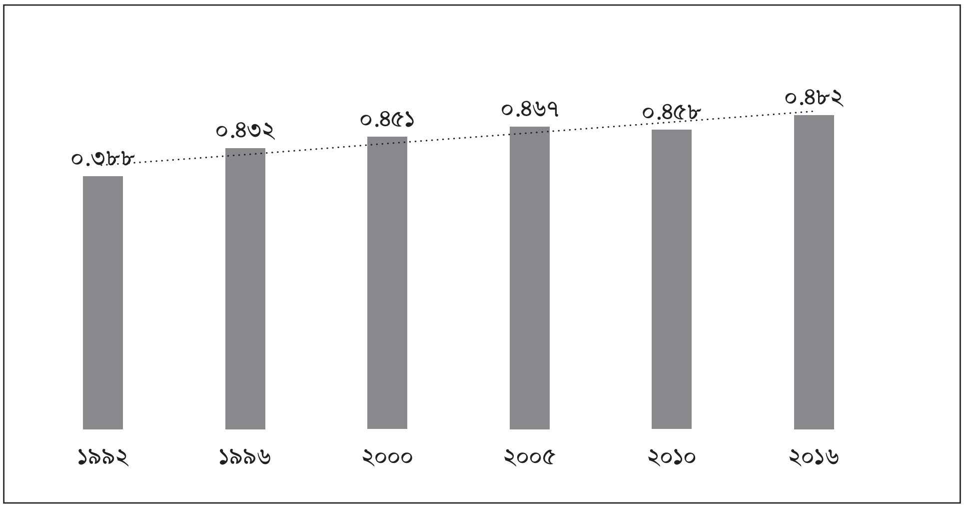

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২০১৬ সালে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষের আয়ের অংশীদারিত্ব ২০১০ সালের তুলনায় কমে ১ দশমিক ০১ শতাংশ হয়েছে। ২০১০ সালে ছিল ২ শতাংশ । ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর দারিদ্র্য কমার হার ছিল ১ দশমিক ৭ শতাংশ (সারণী ৬)। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে এ হার কমে ১ দশমিক ২ শতাংশে নেমেছে। দারিদ্র্য কমার হার কমছে, দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে (খানা জরিপ, ২০১৬)।

সারণী ৬: দারিদ্র্য হার

	খানা জরিপ ২০০৫	খানা জরিপ ২০১০	খানা জরিপ ২০১৬
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমা	৪০	৩১.৫	২৪.৩
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমা	২১.১	১৭.৬	১২.৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৬

দারিদ্র্যের আয় স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে দেখানো হয় আয় বাড়ার ফলে দারিদ্র্যের হার কত শতাংশ কমেছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাস করতে সক্ষম কিনা- দারিদ্র্যের আয় স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে বোঝা যায়। ২০০৫-২০১৬ সময়কালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দারিদ্র্য পরিস্থিতি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অগ্রগতি সাধন হয়েছে। (সারণী ৭)। এই সময়ে অন্যান্য দেশের চেয়ে বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসের হার বাংলাদেশে তুলনামূলক কম (৫ শতাংশ) যেখানে ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানে এই হার প্রায় ১৫ শতাংশের কাছাকাছি (সারণী ৭)। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার থাকলেও দারিদ্র্য কমার হার কম। কিন্তু ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভুটানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হারের পাশাপাশি দারিদ্র্য কমার হারও বেশি।

সারণী ৭: দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর দারিদ্র্যের আয় স্থিতিস্থাপকতা (২০০৫-১০১৬)

দেশ	১.৯০ ডলার দারিদ্র্য হার, ২০০৫ (%)	১.৯০ ডলার দারিদ্র্য হার, ২০০৬ (%)	দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক হার, (ডিপি), %	মাথাপিছু জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (জিওয়াই), %	স্থিতিস্থাপকতা (ডিপি/জিওয়াই) (-)
বাংলাদেশ	২৫.৭ (২০০৫)	১৪.৮ (২০১৬)	-৪.৮৯	৪.৮২	১.০১
ভুটান	১৭.৬ (২০০৩)	১.৫ (২০১৭)	-১৬.১৩	৫.২৫	৩.০৭
ভারত	৩৮.২ (২০০৪)	১৩.৪ (২০১৫)	-৯.০৮	৫.০৬	১.৭৯
নেপাল	৪৬.১ (২০০৩)	১৫ (২০১০)	-১৪.৮২	৩.০৬	৪.৮৪
পাকিস্তান	১৬.৫ (২০০৫)	৩.৯ (২০১৫)	-১৩.৪৩	১.২০	১১.১৯
শ্রীলংকা	০৮.৩ (২০০২)	০.৮ (২০১৬)	-১৫.৩৯	৫.৩৮	২.৮৬

এছাড়া এই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রকৃত গড় আয় দ্রুত বেড়েছে। যদিও নেপাল ও পাকিস্তানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক কম ছিল। অন্যদিকে দেশগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যের আয় স্থিতিস্থাপকতায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষণীয় (সারণী ৮)। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের আয় স্থিতিস্থাপকতা সর্বনিম্ন। অর্থাৎ এখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে হারে বাড়ছে বলে দাবি করা হচ্ছে, দারিদ্র্য সে হারে কমছে না।

সারণী ৮: ভিন্ন ভিন্ন দারিদ্র্য হার ব্যবহার করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর দারিদ্র্যের আয় স্থিতিস্থাপকতা

দেশ	সময়	স্থিতিস্থাপকতা (ডিপি/জিওয়াই) (-)			১.২৫ ডলার দারিদ্র্য হার ধরে স্থিতিস্থাপকতা ১৯৯০-২০০৫
		১.৯০ ডলার দারিদ্র্য হার (%)	৩.২০ ডলার দারিদ্র্য হার (%)	৫.৫০ ডলার দারিদ্র্য হার (%)	
বাংলাদেশ	২০০৫-২০১৬	১.০১	০.৪৩	০.১০	০
ভুটান	২০০৩-২০১৭	৩.০৭	১.৮০	০.৮৬	০.৯১
ভারত	২০০৪-২০১৫	১.৭৯	০.৭২	০.২১	০.৩৫
নেপাল	২০০৩-২০১০	৪.৮৪	১.৮৫	০.৩৬	১.১৯
পাকিস্তান	২০০৫-২০১৫	১১.১৯	৪.৪৮	১.২৭	৪.৬৭
শ্রীলংকা	২০০২-২০১৬	২.৮৬	১.৬৯	০.৬৯	০.৬৭

বর্তমানে প্রায় ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী চলমান অবস্থায় রয়েছে। এ দেশে কমপক্ষে একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় আছে এমন লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৮.৪ শতাংশ। ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশে আরও বেশিসংখ্যক মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে। সুবিধাভোগীর হার ছাড়াও আর্থিক বরাদ্দের দিক থেকেও এই খাত পিছিয়ে। এ খাতে আর্থিক বরাদ্দ নেপাল ও ভুটান থেকেও কম। কাজেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর পরিধিতে আরও বেশি মানুষকে সন্নিবেশিত করা এবং তাদের পর্যাপ্ত সুবিধা দেবার বিষয়টা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আকার বেড়েছে। তবে আনুপাতিক হারে বরং তা কমেছে। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় ঝুঁকি বিবেচনায় নতুন নতুন কর্মসূচী যোগ করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষত স্বাস্থ্য খাত, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি এবং নগর দারিদ্র্যের মতো খাতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতা বাড়ানো জরুরী।

সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাথাপিছু জিডিপি বর্তমানে ১৯০৯ ডলার। কিন্তু বাস্তবে মূল প্রশ্ন হচ্ছে কত শতাংশ মানুষ এই আয় করছে। এই আয়ের সঙ্গে দারিদ্র্য কমার হার সাংঘর্ষিক। বিত্তবান শ্রেণীর আয়ের প্রভাবে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের আয়ের ব্যাপারেও ভুল বার্তা তৈরি হচ্ছে। দেশের দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের মাথাপিছু আয় হিসাব করলে দেখা যাবে তাদের আয় সরকার ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে ঢের নিচে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই একটা একটা আন্তর্জাতিক সূচকের আশ্রয় নেন তা হল গোল্ডম্যানস্যাণ্ড নামে একটি কোম্পানি আছে যারা বড় চারটি দেশ-ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনের বাইরে আর কোন কোন দেশ অর্থনীতিতে এগোতে পারে তার একটি তালিকা করেছিল। ২০০৩-০৪ সালে করা এই তালিকায় ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১ তম। এত বছর পরেও বাংলাদেশ সেই অবস্থানেই আটকে আছে। অপরদিকে ভিয়েতনাম তর তর করে এগিয়ে গেছে।

৯. বাজেট ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার অভাব

বাংলাদেশের বাজেটব্যবস্থায় জবাবদিহিতার চর্চা নাই। বাজেট ঘোষিত হওয়ার পর তা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সংশোধিত বাজেট সংসদে উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আলোচনা ছাড়াই তা আইনে পরিণত হয়। কেন সংশোধনের প্রয়োজন হল বা কেনইবা বাস্তবায়িত হল না - কোন তর্কাতর্কি হয় না। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী কণ্ঠভোটে বাজেট পাশ করা ছাড়া সাংসদদের কোন প্রকৃত ক্ষমতাও নাই। অর্থাৎ বাজেটের পুরো প্রক্রিয়াটিতে জবাদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের কার্যকর কোনো ভূমিকা নেই। বাজেটব্যবস্থার আমূল সংস্কার আশু প্রয়োজনীয়।

যদিও বর্তমানে বাজেটে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ দেখানো হয় কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট খাত কিভাবে, কতটুকু কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বা কেন ব্যবহার করতে পারল না তা দেখানোর ব্যবস্থা নেই। ফলে বছরের পর বছর বাজেট বাস্তবায়নে ব্যর্থতা সত্ত্বেও কাউকে কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। বরাদ্দকৃত সম্পদের পরিমাণ দেখানোর পাশাপাশি পূর্বে সম্পদের কতটুকু কি রকম ব্যবহার হয়েছে বা হচ্ছে তা দেখানোও জরুরী। এর মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

১০. উপসংহার

বাজেটে সর্বজনের স্বার্থ রক্ষা না হয়ে গোষ্ঠীতন্ত্রের তথা সুবিধাভোগীদের স্বার্থই হাসিল হয়েছে। এটি দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অসমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো মৌলিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোকপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই বাজেটেও মূল্য সংযোজন কর রাজস্ব আয়ের বড় খাত। আয়করের আওতা বাড়ানো যায়নি। ফলে বাজেট প্রতিক্রিয়াশীল কর কাঠামো থেকে বের হতে পারেনি। সাধারণ জনগণকেই করের বোঝা বহন করতে হবে।

জাতীয় আয়ের হিসাবে গড়মিল লক্ষণীয়। যদিও বলা হচ্ছে জাতীয় আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে তবে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় নির্ধারণী চলকসমূহ ভিন্ন চিত্র দিচ্ছে। প্রবৃদ্ধি চলকগুলোর অবনমন লক্ষণীয় যা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

বাজেটে উৎপাদনশীল খাতে তেমন বরাদ্দ রাখা হয় নি। সুদাসল পরিশোধ এবং বেতন-ভাতার মতো খাতেই অত্যধিক বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতগুলো বরাবরের মতোই অবেহেলিত থেকেছে। ফলে পর্যাপ্ত মানবসম্পদ ও দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরী ব্যাহত হবে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

নীতিমালা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অব্যবস্থাপনার পাশাপাশি আর্থিক খাতের অব্যবস্থাপনা অর্থনীতিতে বিনিয়োগের চাহিদা কমিয়ে দিচ্ছে। টেকসই ও স্থিতিশীল অর্থনীতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল প্রণয়নের পাশাপাশি আদিম প্রক্রিয়ায় সম্পদ অর্জনের ব্যবস্থা ভাঙ্গা অপরিহার্য। দুর্নীতি, ঋণখেলাপী ও করখেলাপীর সংস্কৃতি বন্ধ করা না গেলে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। যে সমস্ত দেশে এগুলো বন্ধ করা যায়নি তারা অর্থনৈতিকভাবে তলানিতে আছে বা সাময়িক ভাল করলেও তা বজায় রাখতে পারেনি।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও অংশগ্রহণ ব্যাহত হয়েছে। অর্থনীতিকে সুষ্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার বিকল্প নেই। রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি কার্যকর, দক্ষ, শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা জরুরী হয়ে পড়েছে যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং ভারসাম্যহীনতা দূর করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান যেমন ভাঙছে তেমনি অনানুষ্ঠানিক রীতি, রেওয়াজ, প্রথা ইত্যাদিও ভঙ্গুরমান। প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙ্গে গেলে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না। মানুষের শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না। রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা ও ভারসাম্য থাকবে না। রাষ্ট্রের তিনটি অংশ তথা আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি দরকার। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এ ক্ষেত্রে বড় বাঁধা। সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব, কর্মচারিদের দক্ষতার মনিটরিং প্রয়োজন। প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ ও পরিবীক্ষণের পাশাপাশি আয়-ব্যয়ের জবাবদিহিতার বিষয়ে সঠিক তথ্য-উপাত্তও দরকার।

রাষ্ট্রকে সর্বজনের এবং সর্বজনীন করতে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বড় রকম পরিবর্তন দরকার। অগ্রসরমান বাংলাদেশের জন্য ভিশন থাকতে হবে। আর এই ভিশন আসে দর্শন থেকে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দর্শন গৌরবান্বিত মুক্তিযুদ্ধ দিয়েছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আন্তর্জাতিক আকাঙ্খা-'কাউকে পেছনে না রাখা'। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই আকাঙ্খার বাস্তবায়নই হতে পারে - আগামীর অগ্রসর ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ।

রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারপারসন, উন্নয়ন অন্বেষণ, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

তথ্যসূত্র

অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৯, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৯, বাজেট ইন ব্রিফ ২০১৯, ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রণালয়
https://mof.gov.bd/site/view/budget_mof/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-

অরবিন্দ সুব্রামানিয়ান, ২০১৯, ইন্ডিয়া'স জিডিপি মিস-এস্টিমেশনঃ লাইকলিহুড, ম্যাগনিটুডস, মেকানিজমস, এন্ড ইমপিকেশন্স, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিঃ সেন্টার ফর ইন্টারনেশনাল ডেভেলপমেন্ট

এম এ তসলিম, ২০১৯, ইজ দ্যা এক্সপোর্ট-লেড গ্রোথ মডেল পাস, ঢাকাঃ বিডিনিউজ২৪.কম
https://opinion.bdnews24.com/2019/03/20/is-the-export-led-growth-model-passe/

বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ব্যাংক https://www.bb.org.bd/econdata/bop.php

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৬, খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ঢাকাঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮, শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৬-১৭, ঢাকাঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

হাছান আদনান, ২০১৯, খেলাপি ঋণের হারঃ সারা বিশ্বে কমছে বাংলাদেশে বাড়ছে, ঢাকাঃ বণিকবার্তা

cgs Centre for Governance Studies

45/1 New Eskaton, 2nd Floor, Dhaka 1000, Bangladesh